

অবহেলিতের স্বপ্নপূরণে রূপকথা

বিকাশকান্তি মিত্র

সংক্ষিপ্তসার : সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দেব। দেব থেকে দন্দু। দন্দু ছাড়া সভ্যতা এগোয় না। সমাজে যারা আর্থিক, সামাজিক, শক্তি কিংবা সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল, অসমর্থ, তারা চিরকাল ধনী, বলবান, উচ্চবর্গ, উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হয়। এটাই প্রায় দস্তুর। সমাজে দুর্বল যে, কিংবা গরীব যে, চিরকাল তারা ধনী ও বলবানের শোষণের শিকার। শোষিত যে, কিংবা নিপীড়িত বা পরাজিত যে, তারা জীবনে কখনও যে জয় পায় না, এমন নয়। তবে সে বড় দুঃপ্রাপ্য মুহূর্ত। জীবনে পদে পদে মার খাওয়া এই মানুষগুলো পরাজয়ের তলানিতে এসে যখন আর পারে না, তখন একবার ঘুরে দাঁড়াতে চায়, একবার হলেও চায় জয়ী হতে। সে জয় বাস্তবে হলে তো ভালো, না হলে স্বপ্নের মধ্যে। সৃষ্টি আর স্বপ্ন মানুষের সবচেয়ে বড়ো সাফল্যের হাতিয়ার। সমাজের ব্রাত্য, দলিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের স্বপ্ন কী ভাবে তাদের সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে তা ধরার চেষ্টা এই নিবন্ধে, রূপকথা তার প্রাথমিক প্ল্যাটফর্ম।

সূচক শব্দ : অবহেলিত, স্বপ্নপূরণ, রূপকথা

মূল প্রবন্ধ

শুরুরতেই একটা গল্প বলা যাক।

গল্পটা পরিচিত। সিংহ আর খরগোশের গল্প। সিংহ বনের রাজা। তার ভয়ে বনের যত নিরীহ পশু সবাই আতঙ্কিত। আতঙ্কের কারণ আর কিছু নয়, সিংহমশাই কখন যে কার ঘাড়ে বাঁপিয়ে পড়েন, বলা যায় না। দিন নেই, রাত নেই, সবার মধ্যে ভয়। অস্থির পশুগুলো ঠিক করল, এভাবে বাঁচা যায় না, তাই সবাই মিলে রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে একদিন বলল, তিনি খান, সে অধিকার তাঁর, কিন্তু এ ভাবে অতর্কিতে আক্রমণ না করে তিনি যদি ঘরে বসে থাকেন, তাহলে তারা পালা করে এক একজন খাদ্য হিসেবে একেবারে তাঁর গুহাতে গিয়ে হাজির হয়। এতে মহারাজের কষ্টও লাঘব হয়, খাদ্যেরও অভাব হয় না।

শুনে তো মহারাজ খুব খুশি। খুশি বজায় রাখতে এক একদিন এক একজন যায়। তো সেদিন ছোট্ট খরগোশের পালা। ছোট্ট খরগোশ করল কী, নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা সময় পরে গিয়ে হাজির হল মহারাজের কাছে। সিংহের তো ততক্ষণে পেট চৈঁ চৈঁ, মাথা আগুন। খরগোশের দেরি দেখে চিৎকার করে জানতে চান, বিলম্বের কারণ কী?

খরগোশ জানায় যে, সে সময়েই আসছিল, কিন্তু পথে এক মহারাজ তাকে আটকে খেতে চাইল, তাতে তার দেরি।

বনের মধ্যে আর এক মহারাজ! তার আবার প্রতিদ্বন্দ্বী! শুনে সিংহমশাইয়ের অহং-এ লাগল ঘা। চল তো দেখি কোথায় আর এক মহারাজ?

ছোট খরগোশ সিংহকে নিয়ে হাজির করল বনের মধ্যকার এক গভীর কুয়ার ধারে। কুয়ার ধারে গিয়ে সে কুয়ার গভীর জলের দিকে দেখিয়ে জানাল যে, আর এক মহারাজ আছে ওই নীচে।

জলের দিকে তাকিয়ে সিংহ দেখল, সত্যিই তো। নিজেরই তর্জন-গর্জন প্রতিফলিত আর প্রতিধ্বনিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ সিংহ এক সময় ভাবল, সেই বনের রাজা, তার রাজত্বে এ সব প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে সহ্য করবে কেন?

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। কয়েকবার গর্জন করে কোনো সুরাহা হচ্ছে না দেখে, শত্রুকে মারতে ক্রোধে গর্জন করে সিংহমশাই দিলেন কুয়োতে ঝাঁপ, আর উঠলেন না।

এ গল্পে খরগোশ বিজয়ী। আর এক গল্পে, বিজয়ী খরগোশের একদিন মনে হল কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ে নামলে হয়। যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবস্থা। দৌড়ের জন্য তৈরি দু'জন। দৌড় শুরু বললেই দৌড়াবে। কিন্তু সূচনা বিন্দুতে বসে খরগোশের মনে হল, সে কচ্ছপের সঙ্গে পাল্লা দেবে? তাই হয়? তার কি মান সম্মান বলে কিছু নেই? অহং-এ খরগোশ মনে মনে ঠিক করল, যাক তো আগে কচ্ছপ, কতদূর যাবে! যেতে থাক। ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। খরগোশ সেই মত ঘুমিয়ে পড়ল, ইত্যোবসরে কচ্ছপ তার যথাসাধ্য চেষ্টায় সীমানার কাছে পৌঁছাতে, খরগোশের গেল ঘুম ভেঙে। ঘুম ভেঙে দৌড় শুরু করল, কিন্তু সীমানার কাছে যাওয়ার আগেই তার অহং পড়ল ঝরে। কারণ আর কিছু নয়, কচ্ছপ ততক্ষণে পার হয়ে গেছে সীমানা।

ছোট থেকেই আমরা জানি, গল্পদুটো নীতিগল্প।

কেবল-ই কি নীতিগল্প? স্বপ্নপূরণের নয়?

স্বপ্নপূরণের যদি হয়, প্রশ্ন, কার স্বপ্ন, কাদের স্বপ্ন?

ঈশপের গল্পের ব্যাঙ ফুলে ফুলে একদিন হাতি হতে চেয়ে বিপদ ডেকে এনেছিল। ব্যাঙ বিপদ ডেকে এনেছিল বলে কি কুঁজো মানুষের চিত হয়ে শুতে ইচ্ছা করে না? অবহেলিত কেউ, বা উপেক্ষিত কেউ, তার কি একদিন জিততে ইচ্ছা হয় না? হয়, কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম। সেখানে সব সময় এই জয় সহজ হয় না। আর এই সহজ জয় না হওয়া থেকেই দুর্বল বা অবহেলিতের অবচেতনে তৈরি হয় এক রকম ইচ্ছা। অবদমিত সে ইচ্ছা। যে ইচ্ছাটা তার স্বপ্ন। স্বপ্ন যখন বাস্তবে সফল নয়, তখনই তা সৃষ্টিতে হয়ে ওঠে মুখর। আমাদের প্রবন্ধের অভিমুখ এখান থেকেই শুরু।

সৃষ্টির মনের কথা, মনে হয় দ্বৈধ। কার্লমার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলত এটাই ভিত্তি। সভ্যতায় যেদিন থেকে ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব, দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সেই থেকে। সম্পদে অধিকার নিয়ে সংঘাতের উদয়। সম্পদ নিয়েই সংঘাত, সম্পদ থেকেই শ্রেণীবৈষম্য। অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তি, শক্তি ও ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে সমাজে যে শ্রেণীবৈষম্য, সেখানে ক্ষুদ্র, দুর্বল বা অধস্তন চিরকাল-ই অবহেলিত, পারতপক্ষে পরাজিত-ই বলা যায়। জয়ের ভাবনা তাদের কাছে বাতুলতা মাত্র। সমাজ যেখানে শোষণে-নিপীড়নে, অত্যাচার-অবহেলায়, সবলে-দুর্বলে দ্বিধা বিভক্ত, সেই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে জয় তো চিরকালই একপাক্ষিক এবং সবলের দিকে তার পাল্লা ভারী।

বাস্তবের এই প্রতিকূলতায় দুর্বলের ইচ্ছাপূরণ তাই বহুলাংশে স্বপ্নঘেঁষা, কল্পনানির্ভর। স্বপ্ন ও কল্পনা মিশিয়ে যে সাহিত্য, যে শিল্প বা সৃষ্টি, তাতেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা। সাহিত্যও তো বাস্তবের প্রতিবিশ্ব কিংবা অবদমিত মনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি, তাই স্রষ্টার কল্প-বাস্তবতাও সব সময় উপেক্ষার নয়। মূলত রূপকথাই আমাদের প্রতিপাদ্য, তবু তার মধ্যে একই সঙ্গে যেন মার্ক্সের সঙ্গে ফ্রয়েডের সহাবস্থান।

কার্ল মার্ক্সের শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত ভাবনার একটা সম্প্রসারিত রূপ আমরা পাই ইতালীয় মার্ক্সিস্ট দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির ‘Prison Notebook’ গ্রন্থে। সেখানে গ্রামসি একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, ‘Subaltern’, ‘Subaltern’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘নিম্নবর্গ’ বেশ জনপ্রিয়। জনপ্রিয় হলে কী হবে, নিম্নবর্গ আর অবহেলিত সামগ্রিক ভাবে এক নয়। অবহেলিত আর নিম্নবর্গ এক না হলেও, পদাবলীর সুরে প্রায় সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, সব নিম্নবর্গ-ই অবহেলিত, কিন্তু সব অবহেলিত-ই নিম্নবর্গ নয়। একটু দেখে নেওয়া যাক।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মুখ্যত নিচুজাতের বলে যারা দীর্ঘদিন সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, তাদেরকে আমরা একবাক্যে নিম্নবর্গ বলে অভিহিত করতে পারি। এই নিম্নবর্গ নিঃসন্দেহে অবহেলিত, কিন্তু সকল অবহেলিতকে যে নিম্নবর্গ হতে হবে এমন কোনো অর্থ নেই। মুখ্যত বিভ্র, লিঙ্গ, শিক্ষা, সংখ্যা, শক্তি, ক্ষমতা, ইত্যাদির নিরিখে সমাজে যে শ্রেণীবৈষম্য, সেখানে অধস্তন মাত্রেই চিরকাল অবহেলিত। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবহেলিতের আবার নানান মাত্রাভেদ হতে পারে। স্থূলভাবে বলা যায়, জাতপাত বা সামাজিক দিক থেকে দেখলে নিম্নবর্গ, গণ্ডি ছোটো করে বললে বা সাংসারিক দিক থেকে উপেক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে নিম্নবিভ্র-ই অবহেলিত। অবহেলিতের মাত্রাভেদ এখানেই শেষ নয়, রাজনৈতিক দিক থেকে পরাজিত একটি দল, বিজয়ী দলের কাছে অবজ্ঞার-ই পাত্র। এমন কী শরীর বা মনের দিক থেকে প্রতিবন্ধী কেউ সক্ষম কারুর পরিপ্রেক্ষিতে তো অবহেলিত-ই। শুধু কেবল তাই নয়, বিশেষ কোনো রোগে আক্রান্ত কেউ, আমাদের সমাজের বিধবা নারী, ঋতুমতী কোনো মেয়ে, সন্তানহীন বা সন্তানহীনা পুরুষ-নারী, এমন কী ধর্মীয় দিক থেকে সংখ্যালঘু যে কেউ প্রেক্ষাপট মোতাবেক অবহেলিত-ই। এ সব তো আছেই। তবে আলোচনার সুবিধার্থে ব্যাপক অর্থে লোকসমাজকে আমরা অবহেলিত বলেই বিবেচনা করব। কেবল আমাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে নয়, নাগরিক দৃষ্টিতে গ্রামের লোক সাধারণ মাত্রেই অবহেলিত। তারা Folk বা লোক। তাদের সৃষ্টি সাহিত্য, লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যে লোকসমাজ বা তাদের অস্তিত্ব অবস্থান কেমন তা একটা গবেষণার বিষয় বটে, তবে আমাদের এ পর্যায়ে লক্ষ্য কেবলমাত্র লোকসাহিত্যের কথা অংশ, পুরো কথা নয়, কথার বিশেষ শাখা রূপকথাতেই সীমাবদ্ধ। রূপকথায় কীভাবে সমাজের, সংসারের অবহেলিত জন তাদের স্বপ্নপূরণের পটভূমি খুঁজে পায়, এ পর্বে তারই আলোচনা।

যাকে আমরা লোককথা বলি, তার নানাবিধ শাখা। যেমন, পশুকথা/উপকথা বা Animal Tale, পরীকথা/রূপকথা বা Fairy Tale, ব্রতকথা বা Sacred Tale, রঙ্গকথা/রসকথা বা Joke and Anecdote, লোকপুরাণ বা Myth, নীতিকথা বা Fable ইত্যাদি। লোককথা বা লোকসাহিত্যের বিশেষত্ব হল, তা ঞ্জতি ও স্মৃতি নির্ভর। সমাজের সাধারণ মানুষ, সমাজ যাদের ব্যক্তিগত পরিচিতির স্বীকৃতি দেয় না, লোককথা বা লোকসাহিত্য তাদেরই মৌখিক সৃষ্টি। সাহিত্যের এই মৌখিক ধারা সঙ্গত কারণেই অষ্টাজনের জীবনের ছবিকেই প্রতিপাদ্য করে। সমাজের এই সাধারণ মানুষ মূলত উপেক্ষিত জনতা, যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সকল দিক থেকে অবহেলিত। সাহিত্য ও ইতিহাসের চরিত্র হিসেবেও যারা ‘সভ্যতার পিলসুজ’, অবহেলাই যাদের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া, তাদের মুখে মুখে, কথায় কথায়, স্মৃতিতে স্মৃতিতে যে গল্পের পরম্পরা চলতে থাকে, স্বভাবতই তাতে তাদের জীবনসংগ্রামের কথা থাকার কথা। হোক না সে রূপকথা

কিংবা উপকথা, নীতিকথা বা ব্রতকথা। যে কারণে রাশিয়ান লোকসংস্কৃতিবিদগণ বলেন, যে, লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য মুখ্যত শ্রেণীসংগ্রামের ছায়ায় পুষ্ট। সংগ্রামের মধ্যেই স্বপ্ন, তার মধ্যেই ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা। লোককথার এক একটা ধারায় ইচ্ছাপূরণের এক এক রকম ছবি।

আমরা যাকে রূপকথা বলি, সে আসলে এক রকম কল্পকথাও বটে। স্বপ্নকথাও বলা যায়। বাস্তবে যে স্বপ্ন পূরণ হয় না, রূপকথায় তার মুক্তি খোঁজার চেষ্টা। উপকথা বা পশুকথা পশু-পাখির আদলে মানুষেরই স্বপ্নপূরণের কথা। জীবনে যা কিছু সৎ, যা কিছু উচিত, কর্তব্য, তা প্রতিষ্ঠার গল্প হল নীতিকথা। নীতিকথা তো মানুষের জীবনের পথ চলার পাথেয়। আর ব্রতকথা হল ধর্মের মোড়কে স্বপ্নপূরণের প্রার্থনা।

রূপকথার প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপকথায় কেবল যাদের সৃষ্টি তাদের স্বপ্নের বীজ পোঁতা থাকে তাই নয়, রূপকথা সামগ্রিক মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা মুক্তির ক্ষেত্র। তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্র, তের নদী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সাপের মাথার মণি, মণির আলোয় অন্ধকার কিংবা জলের মধ্যেও পথ খুঁজে পাওয়া, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি—এক যাদু কাঠির স্পর্শ—যার ছোঁয়ায় সব কিছু মুহূর্তে মেলে, মুহূর্তে সংঘটিত হয়—এমন যাদু কাঠি পাওয়ার স্বপ্ন মানুষ মাত্রেরই মনের অবদমিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। সেই ইচ্ছাপূরণের গল্প রূপকথা।

আজ দন্দমূলক বস্তুবাদ, কিংবা মনস্তত্ত্বের আলোকে বিচার করে লোককথার নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যাত হচ্ছে নানা দৃষ্টিকোণে। তবে মনে রাখতে হবে যে, কোনো সিগমুন্ড ফ্রয়েড বা কার্লমার্ক্স বা আন্তোনিও গ্রামশির গবেষণা বা ভাবনা চিন্তার উপর নির্ভর করে এ সব লোককথার সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবীর লোককথার ভাণ্ডার হাজার হাজার বছরের পুরানো। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর বাস্তবের প্রতিকূলতা মিলে, তার সঙ্গে মনের অবদমিত ইচ্ছা জুড়ে এসব গল্প তৈরি। এর মধ্যে মানুষের সাধারণ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা যেমন অভিব্যক্ত, তেমনই বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও বীজাকারে প্রোথিত।

সেই বিশেষ শ্রেণী হল, এসব গল্পের স্রষ্টা, সমাজের অবহেলিত মানুষজন। প্রারম্ভিক উদাহরণ হিসেবে দেওয়া গল্পের খরগোশ এবং কচ্ছপ সেই সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ। তবে খরগোশের মধ্যে ঘটে গেছে মাত্রান্তর। প্রথম গল্পে খরগোশ দুর্বল, অসহায় শ্রেণীর প্রতিনিধি। সিংহ শাসক বা অত্যাচারী সমাজের। খরগোশ যখন অসহায়, অবহেলিত তখন সে বিজয়ী। আর খরগোশ যখন দান্তিক, ক্ষমতাসম্পন্ন, তখন সে পরাজিত। খুব স্বাভাবিক ভাবে মোটিফটি স্পষ্ট, যে, দুর্বল বা অবহেলিত তারা তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করতে না পেরে সৃষ্টিতে সে সাধ পূরণ করতে চায়। বিশ্বের অধিকাংশ লোককথায় বিষয়টি লক্ষ্য করে স্টিথ থম্পসন এটাকে একটি মোটিফ হিসেবে সূচিত করে মান্যতা দিলেন। তাঁর ‘মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার’ গ্রন্থের ‘L 300 - L 399’ সংখ্যাটিকে তিনি চিহ্নিত করলেন ‘Triumph of the Weak’ মোটিফে। রূপকথায় অবহেলিতের স্বপ্নপূরণ বা অবহেলিতের স্বপ্নপূরণের রূপকথা, যাই বলি না কেন, আমাদের আলোচনার মূল অভিপ্রায়ের চাবিকাঠিটি এখানে নিহিত। যে দুর্বল, যে অবহেলিত বা ছোট যারা, ঘুরেফিরে তারাই যেন জিতে যায় রূপকথায়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

রূপকথার গল্পে আমরা লক্ষ্য করি ছোটরাণী, ছোট রাজকন্যা, ছোট রাজপুত্র, কিংবা ছোটবউ, ছোটমেয়ে সবাই কোন না কোন ভাবে উপেক্ষা আর অবহেলার শিকার। এই অবহেলার একটা ফিরতি প্রতিক্রিয়াও আছে গল্পগুলোতে।

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ গ্রন্থের ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পের আঁটকুড়ো রাজা সন্তানের মুখ দেখেন এক সন্ন্যাসীর কৃপায়। সন্ন্যাসী এক টুকরো শিকড় দিয়ে সাত রাণীকে সমান ভাগে ভাগ করে খেতে বললে, তা কীভাবে ভাগ করবে ভেবে শিলে বেটে খায় রাণীরা। সে সময় ন’ আর ছোটরাণী সেখানে না থাকায় তারা ভাগ পায় না। তারপর তারা সেখানে আসলে বড় রাণীরা বলে, শিলধোয়া জল খেতে। খায়ও তাই। তারপর যথা সময়ে সাত রাণী সন্তান সম্ভবা হয় এবং সন্তানের জন্ম দেয়। কেবল ন’ আর ছোট রাণী জন্ম দেয় প্যাঁচা আর বাঁদর। তা দেখে ক্ষুব্ধ রাজামশাই ন’ আর ছোট রাণীকে তাদের প্যাঁচা আর বাঁদর সন্তানসহ রাজপুরী থেকে বের করে দেন। স্বাভাবিক, কোন রাজা প্যাঁচা আর বাঁদরকে সন্তান বলে মানবেন?

রাজা মানুন আর না মানুন, গল্পে লোকমানস কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে। ইতোমধ্যে রাজপুত্রেরা বড়ো হয়ে রাজকন্যা সন্ধান করতে গেলে বাঁদর ও প্যাঁচা বা বুদ্ধ আর ভুতুমও যায়। যায় না কেবল, আসা যাওয়ার পথে দাদাদের দ্বারা নানা ভাবে লাঞ্চিত আর অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধ কিন্তু কলাবতী রাজকন্যাকে জয় করে নিয়ে আসে। ভুতুমের সঙ্গেও এক রাজকন্যার বিয়ে হয়। বুদ্ধ আর ভুতুমের এই রাজকন্যা লাভ অনেক পরীক্ষা আর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। রাজা বুদ্ধ আর ভুতুমের মুখে অন্য রাণী আর তাদের ছেলেদের কুকীর্তির কথা শুনে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন, ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ন’ আর ছোট রাণীকে। অবহেলিত বা দুর্বল বা ছোটদের এই জয়ে একটাই আক্ষেপ। রাজপুত্রেরা বাঁদর আর প্যাঁচা। সে আক্ষেপও ঘুচে যায় পুত্রবধূদের বুদ্ধিতে। রাতে বুদ্ধ আর ভুতুম ঘুমিয়ে পড়লে তাদের স্ত্রীরা প্যাঁচা আর বাঁদরের খোলস দুটো পুড়িয়ে দিলে বুদ্ধ আর ভুতুম আর বাঁদর-প্যাঁচা হতে পারে না। তাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে। রাজা, ন’ আর ছোটরাণীর আনন্দ আর ধরে না। রাজ্যবাসীও খুশি হয়। পাঠক-পাঠিকাও। এ গল্প তাই কেবল উপেক্ষিতের বা অবহেলিতের জয়ের গল্প নয়, আমাদের ইচ্ছাপূরণ বা wish fulfilment এর গল্পও বটে। ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে কোথায় যেন গল্পের চরিত্র, পাঠক, স্রষ্টা আর অবহেলিত লোকমানস একই প্লাটফর্মে এসে যায়। আর এ ছবি দেশি-বিদেশি সব রূপকথায় প্রায় কম বেশি লক্ষ্য করা যায়।

দুর্বলের জয় বা অবহেলিতের সাফল্যের ছবি আমরা দেখি ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পেও। সেখানেও রাজার সাত রাণী। সতীন সমস্যা। বড়ো রাণীরা দেমাকী আর হিংসুটে, ছোটরাণী শান্ত। আঁটকুড়ো রাজার মনে শাস্তি নেই। একদিন শোনে, ছোটরাণীর সন্তান হবে। ছোট রাণীর সন্তান হল, সাতপুত্র, এক কন্যা। কিন্তু বড়ো রাণীরা হিংসায় সে সন্তানদের ছাইয়ের গাদায় পুঁতে রাখল। রাজাকে জানাল, ছোট রাণীর সন্তান হয়েছে, না ছাই, কতকগুলো ইঁদুর আর কাঁকড়া। রাজা দিলেন ছোট রাণীকে তাড়িয়ে, সে হল ঘুঁটে কুড়ানী। ছাইয়ের গাদায় সাতভাই জন্মাল চাঁপা গাছ হয়ে, বোন হল পারুল। ছোটবোন পারুলের বুদ্ধিমত্তায় তারা উদ্ধার পেল। ভুল ভাঙল রাজার, বড়োরাণীরা শাস্তি পেল, জয় হল ছোটরাণীর। ছোটবোনের এই কৃতিত্ব, তার জয়, লক্ষ্য করা যায় গ্রীমভায়েদের ‘The Seven Crows’ গল্পে। বোনের জন্মের পর দুর্বল বোনকে বাঁচাতে তাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্যে বাবা সাত ভাইকে জল আনতে বললে, তাদের দেরি দেখে বাবা সাত ছেলেকে অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপে সাত ভাই কাক হয়ে গেলে একসময় বোন গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনে। এখানেও সেই দুর্বলের জয়।

একই ছবি প্রায় ধরা পড়ে ‘ফোক টেলস অব বেঙ্গল’ গ্রন্থের ‘The Bald Wife’ বা ‘টেকো বউ’, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘সুখু আর দুখু’, আর গ্রীম ভাইদের ‘Cinderella’ গল্পে। এমন কী ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ‘শীত-বসন্ত’ গল্পেও একই ছক। সতীন সমস্যা, একজনার প্রতি স্বামীর অধিক গুরুত্ব, অন্য স্ত্রী ও তার সন্তানের প্রতি ভুল বোঝা, চূড়ান্ত অবহেলা। ‘শীত বসন্ত’ গল্পে রাজার দুই রাণী-সুয়ো আর দুয়ো। সুয়োর সুখের অন্ত নেই, দুয়োর দিন কাটে দুঃখে। সুয়োর মনে

হাজার হিংসা, দুয়োর দিন কাটে যন্ত্রণায়। গল্পের শেষে কিন্তু দুয়োরই জয়। ‘টেকো বউ’ গল্পে ছোট বউয়ের মাথায় দু’গাছি চুল, বড়োর এক গাছি। বড়োর মনে হিংসার শেষ নেই। এ ধরনের রূপকথায় হিংসা আর লোভ সব সময় সুখের অন্তরায়। আপাত সাময়িক সুখ হয়তো আসতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সুখ নির্লোভীর, ধৈর্যশীলের। জয় তার এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ছোট বা আপাত দুর্বলের। ‘সুখু আর দুখু’ গল্পের দুখু, কিংবা ‘Cinderella’ গল্পের সিভারেলার সাফল্য ওই ধৈর্য আর নির্লোভীতার ফল। একই রকম ফল প্রায় ‘Little Snow White’ গল্পের মা হারা স্নো হোয়াইটের ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে ওঠে।

‘স্নো হোয়াইট’ গল্পে আমরা স্নো হোয়াইটের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখি সাত বামনকে। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী এই বামনেরা সমাজে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চোখে কিন্তু অবহেলিত। এই অবহেলিত মানুষ কেবল জয়ে সাহায্য করে নি। ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’ গ্রন্থের ‘দেড় আঙুলে’ গল্পে আমরা এই বামন মানুষেরই জয় দেখি। আলোচনার শুরুতে আমরা অবহেলিতের যে মাত্রাভেদ করেছিলাম, তাতে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সন্তানহীন/সন্তানহীনা বা আঁটকুড়াকেও এই পর্যাযভুক্ত করেছিলাম। এই দুই চরিত্রের সাফল্যের গল্প হল ‘দেড় আঙুলে’। আঁটকুড়ো কাঠুরিয়া দম্পতি লোকসমাজে মুখ দেখাতে অপারগ। সবাই তাদের সন্তানহীনতা নিয়ে ব্যঙ্গ করে। শেষমেশ মনসার বরে সন্তান কেবল পায় না, দেড় আঙুলে সে সন্তান দুষ্ট রাজার সকল বদ অভিসন্ধি জয় করে রাজকন্যা লাভ করে।

দুষ্ট রাজার বদ অভিসন্ধি জয় করে রাজকন্যা লাভের এই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ‘ঘ্যাঁঘাসুর’ গল্পের কথা। রাজকন্যার ভীষণ অসুখ, কোন ডাক্তার বৈদ্য পারে না অসুখ সারাতে। শেষে এক সন্ন্যাসী জানান কেউ যদি তাকে লেবু খাওয়াতে পারে, তা হলে রাজকন্যার রোগ সেরে যায়। কিন্তু লেবুর মরসুম না তখন, লেবু কোথায় পাওয়া যাবে? রাজা ঘোষণা করেন, লেবু খাইয়ে যে তার মেয়েকে সুস্থ করতে পারবে, তার সঙ্গে রাজা তার মেয়েকে বিয়ে তো দেবেই, সঙ্গে অর্ধেক রাজ্যও দেবে। শেষমেশ লেবুর সন্ধান মেলে এক চাষির ক্ষেতে। ঝুড়ি ভরে লেবু নিয়ে গিয়েও পথে দেখা এক বামনের সঙ্গে কেবল মাত্র মিথ্যাচারের জন্য চাষির বড়ো ও মেজ ছেলের নিয়ে যাওয়া লেবু ব্যাঙ আর কুমড়োর বীজে পরিণত হয়। অগত্যা ছোট ছেলে মানিক লেবু নিয়ে যাওয়ার পথে বামনের সঙ্গে দেখা হয়, বামন জানতে চায় ঝুড়িতে কী, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

মানিক জানায় যে, রাজকন্যার অসুখ, সে লেবু নিয়ে যাচ্ছে, এই লেবু খেয়ে রাজকন্যার অসুখ সেরে যাবে। বামন বলল, তাই হোক। তাই হল, লেবু খেয়ে রাজকন্যা দিব্যি সেরে গেল। কিন্তু সারলে কী হবে, রাজা খুশি না। কোথাকার কোন চাষির ছেলে কেবল লেবু খাইয়ে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজ্য পাবে, রাজা হয়ে তিনি মানেন কী করে? তাই চাপালেন আরো শর্ত, কাঠের এমন এক নৌকা বানিয়ে আনতে হবে, যা জলে ডাঙায় সমান চলে। বামনের কাছে সত্যি কথা বলে মানিক এ যাত্রায়ও সফল। কিন্তু তাতেও তুষ্ট নন রাজা। তার চাই ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক। মুকুটে পরবেন। রাজা জানতেন, এ বস্তু আনতে গেলে আর প্রাণে বেঁচে ফিরতে হবে না বেচারীর। তখন আর সে রাজকন্যার দাবিদারও হতে পারবে না। মানিক বামন মানুষটার কাছে সত্যি কথা বলে এ যাত্রায়ও সফল। কেবল সফল নয়, ঘ্যাঁঘাসুরের দেশ থেকে মানিকের আনা সোনার লোভে রাজা মানিককে রাজ্য আর রাজকন্যা সাঁপে দিয়ে চলে গেলেন ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে। গিয়ে নদীতে মানুষ পারাপারের বাহকে পরিণত হয়ে গেলেন। দুষ্ট আর লোভীর যা হওয়া দরকার তাই হল। কেবল রূপকথা নয়, নানান ধরনের লোককথা বা লোকসাহিত্যের মধ্যে অবহেলিত, দুর্বল বা কনিষ্ঠ মানুষের এই সাফল্যের ইতিহাসই স্টিথ থম্পসনের ‘Triumph of the Weak - L 300 to L 399’ মোটিফ তৈরির প্রেক্ষাপট রচনা করে দিল।

কথা হল, দুর্বলের এই যে জয়, এ আসলে তার বা তাদের স্বপ্নপূরণের এক ইতিবৃত্ত। জীবনে যারা প্রতিনিয়ত মার খায়, গল্পে তারা জয় খোঁজে। এ জয় আসলে তাদের অবদমিত ইচ্ছারই প্রতিফলন। আমরা তো কেবল বাছাই কিছু রূপকথা নিয়ে, সেখানে দুর্বলের স্বপ্নপূরণের কথা বলার চেষ্টা করলাম। লোককথার অন্যান্য ধারা, যেমন, উপকথা, রসকথা, নীতিকথা, এমন কী মিথোও একই ছবি। ছবির এই সাদৃশ্য হওয়ার কারণ আর কিছু নয়, হাজার হাজার বছর ধরে স্রষ্টার বা বাহকের মনের অবচেতনে থেকে যাওয়া বহমান এক আকাঙ্ক্ষার ধারা এ সব লোককথার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। আর সে ধারা কেবল পশুকথা বা নীতিকথা বা রূপকথায় নয়। আমাদের আধুনিক রূপকথা ‘গুপিগাইন বাঘাবাইন’ কিংবা তার আরও নবতর চলচ্চিত্ররূপ ‘হীরক রাজার দেশে’ও একই ভাবে প্রবাহিত। একই ভাবে প্রবাহিত সাহিত্যের আধুনিক ধারায়ও। কিন্তু সে সব কথা এখানে নয়, অন্য কোথায়, অন্য কোনো ভাবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

- ^১ মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন। ১৯০৭। ঠাকুরমার ঝুলি। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
- ^২ রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, ১৯৬৪। টুনটুনির বই। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড।
- ^৩ রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। ৩য় সংস্করণ, ২০০৪। উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র। সম্পাদক: সুনীল জানা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- ^৪ শর্মা, বিষ্ণু। ১২০০ খ্রীঃ পূঃ। পঞ্চতন্ত্র। অনুবাদক, জি.এল. চণ্ডীরামণী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, দশম সংস্করণ ২০১১; নতুন দিল্লী: রূপা পাবলিকেশনস ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।
- ^৫ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল (অনুবাদক)। ১৯৯০। গ্রীস ভাইদের রূপকথা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- ^৬ Thompson, Stith. 1932. Motif Index of Folk Literature. Blumington, Indiana : Indiana University Press.
- ^৭ ভদ্র, গৌতম (সম্পাদক)। ১৯৯৮। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা: প্রতিভাস।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: bikasmiddya@gmail.com